প্রবন্ধ

শিশুর সামাজিকীকরণ

ডাঃ সঞ্জীব রাহা

সারা বিশ্বের সকল শিশুই এক। আমরা সবাই জানি বীজ অনুযায়ী অঙ্কুরোদ্গম হয়। কুঁড়ি থেকে ফুলে ফলে বিকশিত হতে সহায়ক পরিবেশ পরিস্থিতি ও উপযুক্ত পরিচর্যার একান্ত দরকার। পশুদের জীবন একটা, মানুষের দুটো। বাছুর বড়ো হলে গোরু হয় যায়—অথচ মানুষের বাচ্চাকে মানুষ করতে হয়। পশুদের তুলনায় মানুষের শৈশব দীর্ঘস্থায়ী। এই দীর্ঘ শৈশব ও কৈশোর জীবনের অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে অপরিসীম।

বাইরে মানুষ পশুর মতই। আহার অন্বেষণ করে, আশ্রয় খোঁজে, আরামে থাকতে চায়। কিন্তু ভেতরে? অন্তরের অন্তরে সে-যে অন্য মানুষ। সেখানে সে আশ-পাশের সকলের সঙ্গে এমনকী প্রকৃতির সঙ্গেও নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। সে মিলতে চায়, মিলাতে চায়। পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে বা বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা কঠোর করে কস্মিনকালেও শিশুকে সকলে সাথে একাত্ম হবার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। আশ্রমিক জীবন, দলবদ্ধ খেলাধুলা, আবৃত্তি, গান, নাচ, নাটক, প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন বা শিক্ষামূলক ভ্রমণ থেকেই আমরা 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে' এই শিক্ষাটি নিতে পারি। শৈশবে এই শিক্ষার অভাব ঘটলে আমাদের সারাজীবন ধরে বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা সইতে হয়। শিশু হয়ে ওঠে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। আবার এই বিচ্ছিন্নতা বোধ থেকেই আসে আত্মহননের প্রবণতা। প্রকৃতি, সময়ও সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা আর সৃষ্টিশীল কাজই এই সকল দুর্বিষহ পীড়ন থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে।

আজকাল বাবা-মা অভিভাবকরা শিশুকে শুধু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাবার বাসনা করেন কিন্তু বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরের মত প্রকৃত মানুষ গড়ার কথা চিন্তা করেন না। তবে কি সেই ভুবনেশ্বরী দেবী বা ভগবতী দেবীরা আর নেই? নেই সেই জবরদস্ত পিতারা? আগামী প্রজন্মকে উন্নত করার দায়িত্ব বর্তায় বর্তমান প্রজন্মর উপর। অথচ এখন সকলে ছুটছে 'সোনার হরিণের' পেছনে এক অসম উপার্জন নির্ভর শিক্ষার পেছনে। ছোটো ছোটো পায়রার খোপের মত দশ ফুট বাই দশ ফুটের আবাসন বা ফ্ল্যাট বাড়ি। সেখানে 'সবেধন নীলমণি' সহ তিন চার জন। সকলের দেহে অতিরিক্ত মেদ ও ক্লিশিত মানসিক স্বাস্থ্য। অঢেল ভোগ্যপণ্য, বোকাবাক্স আর ইন্টারনেট ভিডিওগেমের নিষ্ক্রিয় আমোদে শিশুরা মশগুল। এইসব শিশুদের অবস্থা তোতা কাহিনির তোতাদের থেকেও করুণ। তারা সমাজে থেকেও একঘরে। এইসব শিশুরা নানান রকম বীরপূজা যথা শচীনপূজা বা সৌরভপূজা অথবা বিশ্বকাপের সময় ব্রাজিল পূজা বা আর্জেন্টিনার পূজায় ব্যস্ত। ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মত শুধু নেচে নেচে বেড়ানোর মতো অবস্থা। আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটবার পরিকল্পনাহীন এ এক দমবন্ধকর পরিস্থিতি। এই সব শিশুরা সহজেই মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়ে। শরীর ও মনে কমজোরি কেউই সরাসরি সমাজের সাথে মিশতে পারে না। আবার সমাজের সাথে মিলতে মিশতে গিয়ে তাকে কিছু কিছু ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করতে শেখার মাধ্যমে, সে তার চরিত্র গঠন সমাপ্ত করে।

প্রায়শঃ আমরা দেখি গৃহপালিত বা অন্য পশুপাখিদের মধ্যে খেলা-খেলা যুদ্ধ বা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। এ ওকে কামড়ে দিচ্ছে তো মুহূর্তে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুট্টে অপরকে তাড়া করছে। এগুলো সবই কিন্তু 'ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ'। এখন প্রশ্ন হল কে শেখালো ওদের এই খেলা?— আসলে খেলা হল এক সহজাত প্রাকৃতিক ঘটনা। তাই পশুপাখি সহ নিম্নতর বহু জীবজন্তুকে আমরা খেলতে দেখি। অথচ আজকাল শুধু রতনের মা নয়, কল্যাণীর মা কল্যাণীকে খেলতে দিতে চায় না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'সে আপনি বুঝবেন না, এ পাড়ার ছেলে মেয়েরা ভাল নয়—সব ইতর ছোটলোক। তার ওপর আছে মাসে মাসে ইউনিট টেস্টের ঝামেলা। বিকেলে খেললে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন সন্ধে লাগতে না লাগতে ঘুমে ঢুলবে। তাই আমি চাই ঘরে বসে খেলুক, দেখুন কেমন ভি.ডি.ও গেম খেলছে'। আমি সেই সব মায়েদের বুঝিয়ে বলি শোন—অর্থনৈতিক ভাবে কেউ পিছিয়ে পড়লেই সে ছোটলোক হয়ে যায় না—ইতর তো নয়ই। আর পড়ার জন্য তেমন কোন নির্দিষ্ট সময় না থাকলেও একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে বিকেল বেলাই হল খেলার আদর্শ সময়। খেলার মাধ্যমে শরীর ও মস্তিষ্কের গঠন সম্পূর্ণ হয়। তাই তো কোন ব্যাঙ্ক বা অফিসের নয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে খেলার মাঠ ও প্রতি স্কুলে বহুকাল থেকেই একজন খেলার শিক্ষক বা গেম টিচারের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত

করা হয়েছে। যদিও আজকাল শুধুমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থে দিনের খেলা রাতে-কৃত্রিম মহার্ঘ ফ্লাডলাইট জ্বালিয়ে খেলাটাই যেন রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে ভালমন্দের হিসাবের বাইরে। ঠিক যেন শীতকালে পটল এঁচড় আর গরমকালে ফুলকপি মটরশুঁটির মত অসময়ের খাবার খাওয়ার মত অবস্থা।

শিশুকাল থেকেই আমরা খেলতে খেলতে বড় হই। গর্ভাবস্থায় শিশুর নড়াচড়াও হয়তো একধরনের খেলা। জন্মের পর খুব ছোটো শিশু মায়ের দেহাংশ চুল, কাপড়, স্তন ইত্যাদি নিয়ে খেলে। আবার অনেক সময় হাত পা ছুঁড়ে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়েও সে খেলা করে, পরে আশেপাশের প্রাকৃতিক টুকিটাকি যা পায় সবই হয় তার খেলার সরঞ্জাম। আজকাল আমরা বাচ্চাকে নামিদামি ব্র্যাণ্ডের খেলনা কিনে দিই, কিন্তু বুঝিনা রেডিমেড খেলনায় শিশুর মনোজগৎ কতটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইট, কাঠ, কাগজ জল মাটি কাদা প্রাকৃতিক সকল বস্তুই হল তার খেলার সামগ্রী এগুলি বড়দের বিরক্ত উৎপাদনের কারণ হলেও এর মাধ্যমে শিশু আনন্দ ও অপার স্বাধীনতার স্বাদ পায়। আর একটু বড় শিশু স্কুল-স্কুল বা দিদিমণি-দিদিমণি খেলা বা দোকানদারি ও রান্নাবান্না খেলা খেলতে দেখা যায়। এই সব খেলাকে শুধু খেলা হিসাবে না দেখে ভবিষ্যত জীবনের মহড়া বলেই ধরে নেওয়া হয়।

খেলা হল অপচিত শক্তির পুনরুদ্ধারের এক আশ্চর্য ব্যবস্থা। স্টিমইঞ্জিন বা প্রেসার কুকারে যেমন বেশি বাষ্প জমলে ভেন্টওয়েট উঠে উদ্বৃত্ত বাষ্প বেরিয়ে যায়, ঠিক তেমনই শিশু খেলার মাধ্যমে তার উপচেপড়া শক্তিকে বাইরে বার করে দিতে পারে অন্যথায় শারীরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা সবাই জানি গাড়ি না চালিয়ে গ্যারেজে রেখে দিলে তার খাদ্যের (তেলের) প্রয়োজন পড়ে না—গাড়িতে মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায়—তেমনই বাচ্চাকে খেলতে না দিয়ে গৃহবন্দি করে রাখলে তাঁর খিদে হবে না—শরীর ও মনের বাড়-বাড়ন্ত হবে না। তাই আজকের খেলা আগামী কর্মজীবনের জলছবি।

খেলার মাধ্যমেই শিশু তার রঙিন মনের সব কটা জানালা খুলে দিতে পারে। ব্যক্তিগত খেলায় একাগ্রতা ও ধৈর্যশক্তি যেমন বাড়ে তেমন খেলার মাধ্যমে সে বস্তু জগতের ও বহির্জগতের নিয়মকানুন আবিষ্কার করতে শেখে ও তাকে আত্মসাৎ করে নেয়। শিশুরা যে বড়োদের থেকে খর্ব এই হীনমন্যতার অক্ষমতা কাটাবার একমাত্র উপায় হল খেলাধুলা। খেলার মাধ্যমেই শিশুরা নিজেদের ভয়ের পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের চেষ্টা করে।

আবার সমবেত খেলায় খেলতে নামার আগেই আমরা জেনে যাই যে একদল জিতবে আর এক দল হারবে। খেলা শেষে করমর্দন বা হাততালির সাহায্যে আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি যা লেখাপড়ায় সম্ভব নয়। সেখানে শুধু প্রথম হবার প্রতিযোগিতা। সমবেত খেলা বা অ্যাডভেঞ্চারার্স স্পোর্টস যথা ট্রেকিং পর্বতারোহণ, সাঁতার, সাইকেল চালনা, স্কী, হ্যাণ্ড গ্লাইডিং এর মাধ্যমে বিপদে স্থির থাকা, ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিত্যনতুন আবিষ্কারের আনন্দ আমরা পেতে পারি।

শুধু শিশুরা বড়োদের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা নয়, একই সঙ্গে বড়োরা এবং সমাজও শিশুদের দ্বারা সমভাবে প্রভাবিত হতে পারে। রাগী, জেদি, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর অপরাধপ্রবণ মানুষও শিশুদের প্রভাবে শান্ত, ধীর, ধার্মিক, স্নেহময়রূপে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অন্য ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে 'নান্‌হা ফরিস্তা' সিনেমার তিন ডাকাতের বাহিনী বা অসকার ওয়াইল্ডের স্বার্থপর দৈত্য বা 'সেল্ফিস জায়েন্ট' গল্পটি ভীষণভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায় না, তাই শিশুকে জোর করে কিছু শেখানো উচিত নয়। যে শিশু যেদিকে বেশি আকর্ষণ বোধ করে সেটা দিয়েই প্রাথমিকভাবে শুরু করা উচিত, খেলার ছলে গল্পের ছলে সব শেখাতে হবে, তার সক্ষমতার প্রশংসা করতে হবে। শিশুর সফলতার জন্য তাকে পুরস্কৃত করতে হবে। ধাপে-ধাপে তালে-তালে তাকে শেখাতে হবে। শিক্ষার বৈচিত্র্য আনতে হবে। শিশু অকৃতকার্য হলে উপহাসের বদলে উৎসাহ দিতে হবে। সেইজন্য এখন বাড়ি কেনা, গাড়ি কেনা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ কিন্তু শিশুকে প্রকৃত মানুষ করা বা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সত্যিই কঠিন, কারণ যে বা যাঁরা এটা করবেন সেই পিতামাতা অভিভাবক বা শিক্ষক-আগে যে তাঁদের সৎ, সংযমী ধৈর্যশীল, মরমি প্রকৃত মানুষ হতে হবে। শিশুদের অভিভাবক হওয়া আজ যতটা সহজ অভিভাবকত্ব আদায় করা ঠিক ততটাই কঠিন।

"Goodness is greater than Greatness."

পরিশেষে অভিভাবকদের জন্য দশ দফা :

(১) শিশুকে সঙ্গ দিন।

(২) শিশুকে নিঃশর্তভাবে ভালবাসুন।

(৩) তার কাজের সমালোচনা না করে প্রশংসা করুন।

(৪) মোবাইল ফোন, টি.ভি., ভি.ডি.ও গেম, কম্প্যুটার ও ইন্টারনেটের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনুন।

(৫) পরামর্শ দিন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দিন।

(৬) মারধোর ও শারীরিক নিগ্রহ বন্ধ করুন।

(৭) অন্য কারোর সঙ্গে তার তুলনা করা বন্ধ করুন।

(৮) রাত্রে শোবার আগে তার সারাটা দিনের সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করুন।

(৯) সন্তানের অর্জিত ফলে খুশি থাকুন।

(১০) সন্তানকে ঘুষ না দিয়ে তাকে উৎসাহ দিন।